প্রেষণা
Motivation

ইউনিট ৯

প্রেষণার মূল হলো মানুষের প্রয়োজন বা অভাব। মানুষের দেহে ও মনে যখন অভাববোধ থাকে তখন তা পূরণ করার জন্য কতকগুলো লক্ষ্য বস্তুর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ বোধ জন্ম নেয়। লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে যে কাজ করতে হয় তা হলো মানুষের ব্যবহার বা আচরণ। সহজ ভাষায় প্রেষণা হলো মানুষকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করণ। এটি একটি এমন শক্তি যা কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোন ছাত্র যদি মনোযোগের সাথে পড়া শোনা করে তাহলে, তার পেছনে যেমন ধনাত্মক প্রেষণা কাজ করে। আবার কোন ছাত্র যদি পড়া শোনায় অমনোযোগী হয় তার পেছনে ও প্রেষণার অবদান আছে, তবে এটি ঋণাত্মক প্রেষণা অর্থাৎ আমাদের সবকাজের পেছনেই প্রেষণা আছে- তা কাজটি ভালই হোক আর মন্দ হোক। প্রেষণার তারতম্যেও জন্য সংগঠনে কোন কর্মী কাজে মনোযোগী, শৃঙ্খলা পরায়ন এবং উদ্যোগী, আবার কোন কর্মী কাজে অমনোযোগী, বিশৃঙ্খল, নিরুদ্যম হয়। প্রেষণার অভাবে ছাত্রদের মধ্যেও কেউ পড়াশুনা ছেড়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে যায়। এসব ক্ষেত্রে ও তাদেও নিজস্ব প্রেষণা তাদেরকে প্রভাবিত করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : প্রেষণার ধারণা , প্রেষণার বৈশিষ্ট্য , প্রেষণার গুরুত্ব

পাঠ-৯.২ : প্রেষণা চক্র , কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় বা কৌশল

পাঠ-৯.৩ : প্রেষণার তত্ত্বসমূহ,বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি, প্রেষণার সীমাবদ্ধতা

পাঠ-৯.১ প্রেষণার ধারণা, প্রেষণার বৈশিষ্ট্য , প্রেষণার গুরুত্ব

Concepts of Motivation, Characteristics of Motivation, Importance of Motivation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রেষণার ধারণা বলতে পারবেন।
- প্রেষণার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রেষণার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রেষণার ধারণা

Concepts of Motivation

প্রেষণা বলতে বুঝায় মানুষের এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, যা তাকে কোন আচরণ বা কাজে উদ্বুদ্ধ বা চালিত করে। প্রেষণা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। অভাব বা প্রয়োজনবোধ থেকেই প্রেষণার উদ্ভব। নিম্নে বিশিষ্ট মনীষীদের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

M. J. Gannon- এর মতে- "প্রেষণার মূল অর্থ একজন ব্যক্তির প্রয়োজন, আকাঙ্খা এবং ধারণাসমূহ, যা তাকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কাজ করতে উৎসাহ দেয়।"

S. A. Sherlekar এর মতে, যে ব্যবস্থাপকীয় কার্যের সাহায্যে ব্যক্তিবর্গকে কার্য সম্পাদনে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও তাড়িত করা যায় তাকে প্রেষণা বলে (Motivation is a managerial function to inspire, encourage and impel people to take required action)|

H. Weihrich এবং H. Koontz এর মতে, সব ধরনের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং সমরূপ শক্তিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত সাধারণ পদবাচ্যকে প্রেষণা বলে (Motivation is a general term applying to entire class of drives, desires, needs, wishes and similar forces)|

Keith Daris এবং H.John W. Newstrom Gi মতে, কাজের দিকে কর্মীকে ধাবিত করার শক্তিই হল প্রেষণা (Motivation is the strength of the drive towards an action)|

Michael Jucious এর মতে, প্রেষণা হচ্ছে ব্যবস্থাপক কর্তৃক সে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ যা কর্মীদেরকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।

সহজ ভাষায় প্রেষণা হলো মানুষকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। এটি একটি শক্তি যা কোন ব্যক্তিকে, বিশেষ কোন কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কোন ছাত্র যদি মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করে তাহলে, তার পেছনে যেমন ধনাত্মক প্রেষণা কাজ করে, আবার কোন ছাত্র যদি পড়াশোনায় অমনোযোগী হয় তার পেছনেও প্রেষণার অবদান আছে, তবে এটি ঋণাত্মক প্রেষণা অর্থাৎ আমাদের সব কাজের পেছনেই প্রেষণা আছে- তা কাজটি ভালই হোক আর মন্দ হোক।

প্রেষণার তারতম্যের জন্য সংগঠনে কোন কর্মী কাজে মনোযোগী, শৃঙ্খলাপরায়ন এবং উদ্যোগী, আবার কোন কর্মী কাজে অমনোযোগী, বিশৃঙ্খল, নিরুদ্যম হয়। ছাত্রদের মধ্যেও কেউ পড়াশুনা ছেড়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে যায়। এসব ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব প্রেষণা তাদেরকে প্রভাবিত করে।

প্রেষণার মূল হলো মানুষের প্রয়োজন বা অভাব। মানুষের দেহে ও মনে যখন অভাববোধ থাকে তখন তা পূরণ করার জন্য

কতকগুলো লক্ষ্যবস্তুর প্রতি তার তীব্র আকর্ষণবোধ জন্ম নেয়। লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে যে কাজ করতে হয় তা হলো মানুষের ব্যবহার বা আচরণ। বিষয়টি নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ঃ

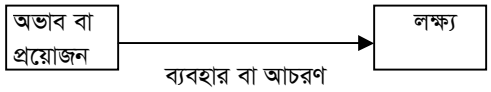

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ধরুন আপনার খুব পিপাসা পেয়েছে। পিপাসা হলো আপনার অভাববোধ বা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে এক গ্লাস পানি আপনার খুবই প্রয়োজন। কেননা, এই এক গ্লাস পানি আপনার পিপাসা পূরণ করতে পারে। কাজেই এটাই হলো আপনার লক্ষ্য। পিপাসা পূরণ হলে আর এই অভাববোধ আপনাকে প্রভাবিত করবেনা। পানি পান করার জন্য আপনাকে কলের কাছে গিয়ে গ্লাস ভর্তি করে অথবা কাউকে পানি খাওয়ানোর অনুরোধ করা বা আদেশ দেওয়ার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে- সেটাই আপনার ব্যবহার বা আচরণ।

এই ধরনের অভাব পূরণের জন্য মানুষের যে বাগ্রতা তাই হলো প্রেষণা। অর্থাৎ মানুষের আচরণকে যা প্রভাবিত করে তাকেই প্রেষণা বলা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে পরিশেষেআমরা বলতে পারি, প্রেষণা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাকীয় প্রক্রিয়া যা কোন কর্মীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সে তার সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। কর্মী যাতে তার সর্বোচ্চ পরিপক্কতা (maximum maturity) প্রয়োগ করতে পারে, মূলত: প্রেষণা সেই কাজটি করে থাকে। প্রেষণাহলোমানুষেরএমনএকটিমানসিকঅবস্থা, যাতাকেকোনকাজেবাআচরণেউদ্বুদ্ধবানিবৃত্তকরে।

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Motivation

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের প্রেষণা দান বা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের কার্যক্ষমতার পুর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া। প্রেষণা এমন একটি প্রক্রিয়া যা শ্রমিক-কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে যৌক্তিক আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে কর্মীরা সর্বোচ্চ পরিপক্কতা প্রয়োগ করতে পারে। তাই এটি একদিকে কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত। প্রেষণা কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে। এবার আসুন, এর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই।

১. **প্রেষণা লক্ষ্য কেন্দ্রিক:** প্রেষণা সর্বদা উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক। একটি প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল কর্মীদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেবা আদায় করা। প্রেষণা উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেষণা উদ্দেশ্য/লক্ষ্যকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

২. **মানবীয় উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত :** একটি প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের উপাদান থাকে। একটি মানবীয় কর্মী এবং অন্যটি বস্তুগত কলকব্জা। প্রেষণার বিষয় শুধু মানবীয় অর্থাৎ শ্রমিক-কর্মীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। তাদেরকেই অনুপ্রেরণা দিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক ধারণা :** প্রেষণা সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। মানুষের ভিতরের কিছু প্রবণতা থেকে প্রেষণার তৈরি হয়। এটা একটি মানবিক শক্তি। বিশেষ চাহিদার কারণে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তৈরি হয়। প্রেষণা কর্মীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং চাহিদা পূরণের ক্ষমতা বাড়ায়।

৪. **প্রেষণা অভাবের সাথে সম্পৃক্ত:** প্রেষণা কর্মীদের অভাবের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথমে অভাবের তাড়ণা আসবে; মানুষ সেটি পুরণ করার চেষ্টা করবে। প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতির একটি অভাব বোধ করবে। প্রতিষ্ঠান যদি তার এই অভাবটি পূরণ করে তাহলে সে অনুপ্রাণিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যাবে। সুতরাং অভাবই হল প্রেষণার ভিত্তি।

৫. **ধারাবাহিক প্রক্রিয়াঃ** সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদার ধরন বদলায়। যেমন ধরুন, এক সময়ে মোবাইল ফোন ছিল না। এটি আসার পর মানুষের কাছে মোবাইল ফোনের চাহিদা বেড়ে গেল। কোন কোম্পানি কর্মীদের একটি করে মোবাইল সেট উপহার হিসেবে দিল। এতে তারা অনুপ্রাণিত হলো। মোবাইল ফোন আসার পূর্বে হয়ত কোম্পানির প্রণোদনা দেওয়ার ধরন অন্য রকম ছিল। সুতরাং বরা যায়, প্রেষণা একটি অব্যাহৃত প্রক্রিয়া। শুরু করে কিছু সময় পর বন্ধ করে দিলে সেটি কার্যকর থাকবে না।

৬. **আর্থিক বা অনার্থিক প্রক্রিয়াঃ** প্রেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি আর্থিক বা অনার্থিক উভয় প্রকৃতির হতে পারে। অনেক সময় কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে প্রেষিত করতে হয়। আবার অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিক বিষয় দিয়ে প্রেষিত করা হয়।

৭. **ইতিবাচক বা নেতিবাচকঃ** X তত্ত্ব বা Y তত্ত্ব অনুযায়ী প্রেষণা ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয় রকম হতে পারে। প্রতিষ্ঠানে কাউকে পুরষ্কৃত করে কার্য উদ্ধার করা যায়– যা ইতিবাচক প্রেষণা। আবার কাউকে তিরস্কার করে কার্য উদ্ধার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে – এ ধরনের প্রেষণা নেতিবাচক।

৮. **কার্যশক্তিঃ** প্রেষণা হল কার্যশক্তি, যা মানুষকে কোন কাজ করা বা না করা থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করে। এটি সরাসরি কর্মীর মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। এতে সে কার্যসম্পদনে প্ররোচিত হয়। সুতরাং প্রেষণা প্রয়োগ করলে কর্মীর ভিতরে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে। সুতরাং প্রেষণা কার্যশক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৯. **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাথে সম্পৃক্তঃ** এ প্রেক্ষিতে একটি খনার বচন প্রযোজ্য। তা হল, যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট তাকে সেই ফুল দিয়েই পূজো করতে হয়। এখানে বোঝানো হয়েছে, প্রতিটা মানুষের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। ফলে ব্যক্তি ভেদে প্রেষণার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রেষণা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দ্বারা পরিচালিত হয়।

১০. **আচরণের মাধ্যমে প্রকাশঃ** প্রেষণা একটি শক্তি যা মানুষের আচরণকে শক্তিশালী করে। প্রেষিত কর্মির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা কাজ করে।

প্রেষণার গুরুত্ব
Importance of Motivation

কর্মীদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা তথা প্রণোদনা দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজে উদ্বুদ্ধ করার এ প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণার ফলে কর্মী তার সকল আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে ব্রতী হয়। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। ব্যবস্থাপনার কাজ হলো অন্যের দ্বারা কাজ করে নেয়া। কিন্তু কাজের ব্যাপারটি কর্মীদের কার্য সন্তুষ্টির সাথে অসম্পর্কীত। প্রকৃতপক্ষে কেউ কাজ করতে না চাইলে তাকে দিয়ে জোর করে কাজ করানো যায় না। তাই আধুনিক ব্যবস্থাপনা কর্মীদের সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। নিম্নে প্রেষণার কতিপয় গুরুত্ব আলোচনা করা হলো–

১. **উচ্চ মনোবল উন্নয়ন (Development of high morale)** ঃ প্রেষণা কর্মীদের উচ্চ মনোবল গঠনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবং কাজের প্রতি অধিক আন্তরিক করে তোলে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিরোধী যে কোন কার্যকলাপে নিরুৎসাহিত করে। ফলে প্রতিষ্ঠানে একটি উত্তম কার্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

২. **অধিক উৎপাদন (Mass production)** ঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে যথাসম্ভব কম ব্যয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনের উপর। এর জন্য অবশ্যই কর্মীদের শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া উচিত। প্রেষণার অভাবে কর্মীরা অকার্যকর হয়ে পড়লে কখনই অধিক উৎপাদন নিশ্চিত হতে পারে না।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase in efficiency)** ঃ কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই কর্মীরা সেই কাজে আনন্দ পায় এবং আনন্দ সহযোগে যে কোন কর্ম প্রচেষ্টা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। প্রেষণার অভাবে কর্মীরা কাজে নিরানন্দ বোধ করে যা ক্রমে তাদের দক্ষতাকে হ্রাস করে।

৪. **উত্তম শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা (Establishing fair labor Management relation)** ঃ উত্তম শ্রম

ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রেষণার দ্বারাই তা অর্জন করা সম্ভব। কর্মীদের মানসিক দিক হতে যত সন্তুষ্ট রাখা যাবে ব্যবস্থাপনার প্রতি তাদের ধারণা ও আন্তরিকতা তত বাড়বে। প্রেষণার অভাবে কর্মীরা আন্দোলন করে এবং এতে করে ও শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক খারাপ হয়।

৫. **অপচয়হ্রাস (Reduction in wastage)** ঃ প্রেষণা অপচয়হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রেষণার অভাবে কর্মীদের শ্রম ঘন্টার যে অপচয় হয় বা কার্যক্ষেত্রে অন্যান্য নানাবিধ যে সকল অপচয় বা ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়, উত্তম প্রেষণার বদৌলতে তা অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

৬. **উদ্যোগ ও উন্নয়ন (Initiaive and development)** ঃ প্রেষণা শুধু মানসিক সন্তুষ্টিই সৃষ্টি করে না তা কর্মীদেরকে নব-নব পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে উত্তম উপায়ে কাজ সম্পাদনে উদ্যোগী করে তোলে। যা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রেষণার ধারণা , প্রেষণার বৈশিষ্ট্য , প্রেষণার গুরুত্ব খাতায় লিখুন এবং আপনার জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ:

প্রেষণা বলতে বুঝায় প্রাণীর এমন একটি অবস্থা, যা তাকে কোন আচরণ বা কাজে উদ্বুদ্ধ বা চালিত করে। প্রেষণা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধিকতর কর্মপ্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা। মানুষ তার কর্মপ্রচেষ্টার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত হলে এ প্রক্রিয়াটি প্রেষণা হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে।

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের প্রেষণা দান বা কাজে উৎসাহ সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের কার্যক্ষমতার পুর্ণ ব্যবহারের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া। প্রেষণা এমন একটি প্রক্রিয়া যা শ্রমিক-কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে যৌক্তিক আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে কর্মীরা সর্বোচ্চ পরিপক্কতা প্রয়োগ করতে পারে। তাই এটি একদিকে কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পৃক্ত। কর্মীদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা তথা প্রণোদনা দানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজে উদ্বুদ্ধ করার এ প্রক্রিয়াকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণার ফলে কর্মী তার সকল আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে ব্রতী হয়। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

পাঠ-৯.২ প্রেষণা চক্র , কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় বা কৌশল

Motivation Cycle, Ways or Techniques of Motivation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রেষণা চক্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় বা কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রেষণা চক্র

Motivation Cycle

প্রেষণা কতিপয় মনস্তাত্ত্বিক ও ধারাবাহিক কাজের সমষ্টি যা কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই ধারাবাহিক কাজগুলো পর্যায়ক্রমে পুনরায় শুরু হয় বিধায় এটিকে প্রেষণা চক্র নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে অভাব বোধ হয় যেখান থেকে চাহিদা সৃষ্টি, পরে অভাব পূরণে অনুপ্রাণিত হয়ে কার্য সম্পাদন করতে থাকে। মূলত মানুষের অভাব অসীম। মানুষ তার জীবনে কোন না কোন অভাব দ্বারা তাড়িত। মানুষের একটি চাহিদা পুরণ হলে অন্য একটি চাহিদা তার সামনে হাজির হয়। প্রেষণা চক্রের আকারে আবর্তিত হয়ে মানুষের এ সব নিত্য নতুন চাহিদা পূরণ করে থাকে। অর্থাৎ প্রেষণা একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের অভাববোধ থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে। প্রেষণা একটিচক্রের ন্যায় আবর্তিত হয় বিধায় এটিকে প্রেষণা চক্র বলা হয়। নিচে প্রেষণা চক্রের একটি চিত্র দেওয়া হল:

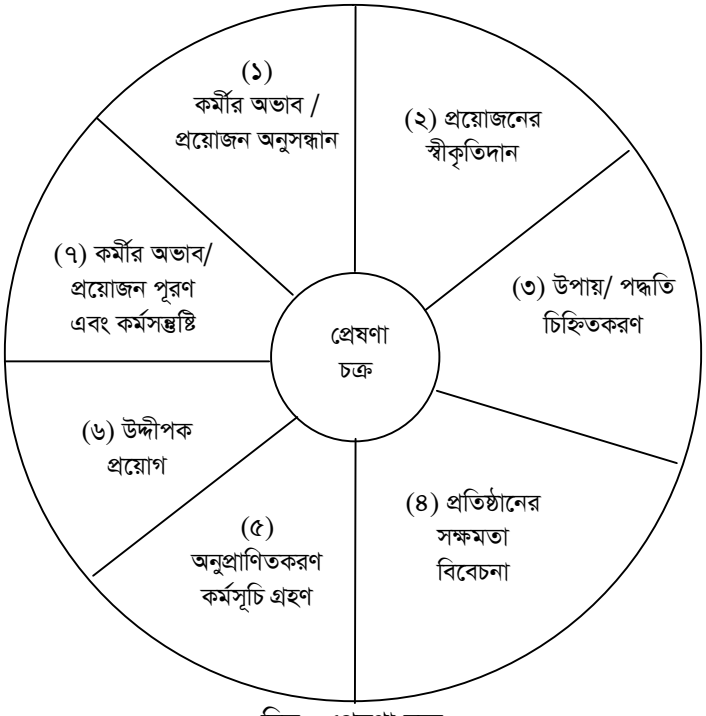

চিত্র : প্রেষণা চক্র

প্রেষণাচক্রের ধাপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **কর্মীর অভাব অনুসন্ধানঃ** প্রেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম কাজ হল কর্মীদের অভাব /প্রয়োজন অনুসন্ধান। এ অনুসন্ধানের মাধ্যমে কর্মীদের উদ্বিগ্নতার মাত্রা বেরিয়ে আসবে।

২. **প্রয়োজনের স্বীকৃতি দানঃ** প্রতিষ্ঠানের সবধরনের অভাব / প্রয়োজনকে চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এ ছাড়া সকলের প্রত্যাশা এক রকম হয় না। সে কারণে সামষ্টিক বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের প্রয়োজনের স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়। এটি প্রেষণা চক্রের দ্বিতীয় ধাপ।

৩. **চাহিদা পুরনের উপায় চিহ্নিতকরণঃ** কর্মীর অভাব বা প্রয়োজন শনাক্ত করার পর তা পূরনের পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে। এটি প্রেষণা চক্রের তৃতীয় ধাপ। এটিকে উদ্দীপক পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতি আর্থিক বা অনার্থিক উভয়ই হতে পারে। শুধু পদ্ধতি চিহ্নিত করা হলেই চলবে না – তা প্রয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনাঃ** কর্মীদের চাহিদা থাকলেই চলবে না। তা পূরণের সামর্থ অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের থাকতে হবে। কতিপয় দাবির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **অনুপ্রাণিতকরণ কর্মসূচি গ্রহণঃ** কর্মীর চাহিদা ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা – এ দুইয়ের মধ্যে সুষম সমন্বয় করে অনুপ্রাণিতকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

৬. **উদ্দীপক প্রয়োগঃ** এ পর্যায়ে নির্বাচিত উদ্দীপকগুলো প্রয়োগ করা হয়। গুরুতের্র তালিকা অনুযায়ী একে একে কর্মীদের চাহিদাগুলো পূরণ করা হয়। প্রথমে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। পরে কর্মীর মনোভাব পর্যালোচনা করে অনার্থিক উদ্দীপক প্রয়োগের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৭. **চাহিদার পরিতৃপ্তিঃ** এটি প্রেষণা চক্রের সর্বশেষ ধাপ। উদ্দীপক ব্যবহারের পর কর্মীদের চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। কর্মীরা কতটুকু পরিতৃপ্ত হলো তা ব্যবস্থাপনা খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং কর্মীর সন্তুষ্টি পরিমাপ করে ।

উপরের ধাপগুলো শেষ হওয়ার পর শুরু হবে নতুন চাহিদা পূরণের বিষয়। এভাবে চক্রাকারে চাহিদা পূরনের ব্যাপারটি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এ কারণে এটিকে প্রেষণা চক্র বলে।

কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় বা কৌশল

Ways or Techniques of Motivation

আধুনিক ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকর্মীদেও নিকট হতে কাজ আদায়ে প্রেষণাদানের গুরুত্ব সকল মহলেই স্বীকৃত।অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রেষণাদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রচলিত থাকলেও একে প্রকৃতি অনুযায়ী আর্থিক ও অনার্থিক দুভাগেভাগ করা যায়।যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মীদেরকে প্রেষণা দানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এগুলোকে প্রেষণার উদ্দীপক বা উপাদানও বলা হয়। প্রতিষ্ঠান ভেদে এ উদ্দীপক ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে। মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য, প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির উপরে ভিত্তি করে প্রেষণাদানের উপায় নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত কর্মীদের প্রেষণা দানের জন্য নিচের উপায়গুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে এর উপাদানসমূহ আলোচিত হলো-

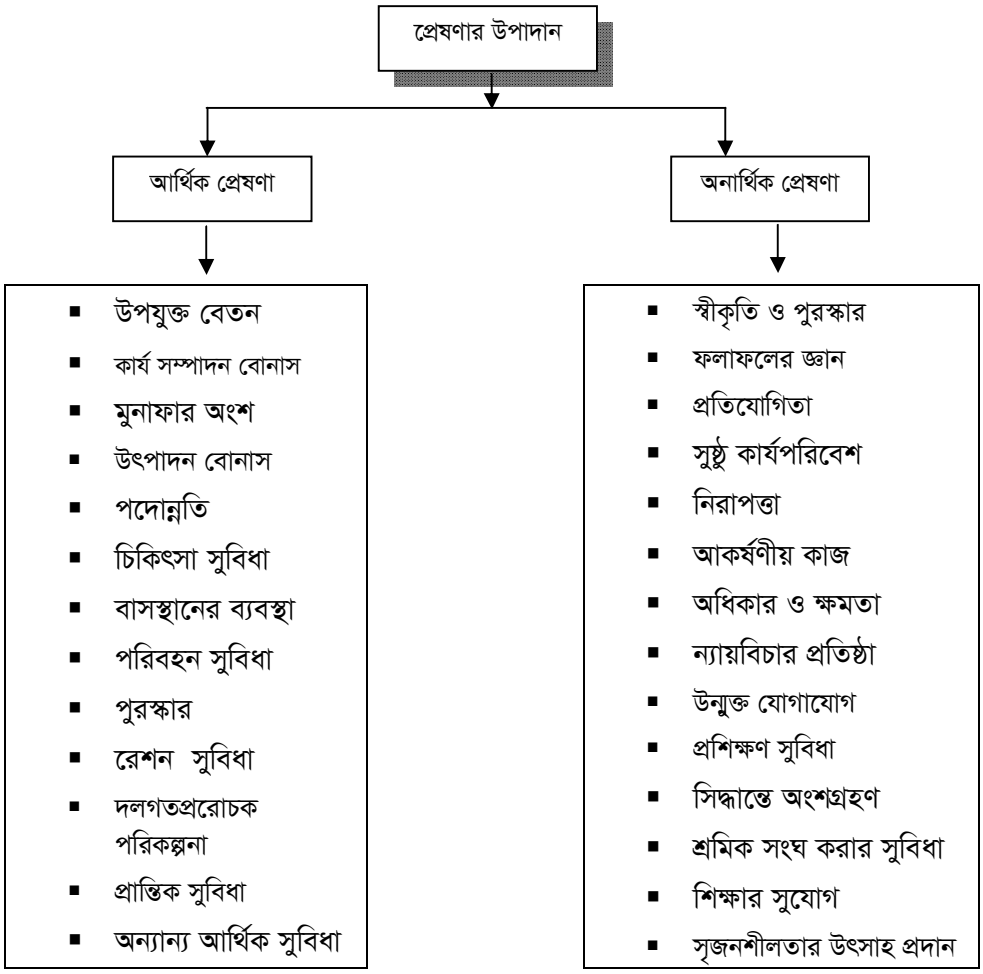

ক. আর্থিক প্রেষণা (Financial Motivation)

বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে কর্মীদিগকে কাজে অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়াকে আর্থিক প্রেষণা হিসাবে অভিহিত করা যায়। অর্থের সাথেই ইহা সম্পৃক্ত। নিম্নে এর উপাদানসমূহ আলোচিত হলো-

১. **উপযুক্ত বেতন (Fair Salary)** ঃ উচ্চ বেতন স্বভাবতই কর্মীদেরকে উদ্দীপ্ত করে। বেতন বলতে এক্ষেত্রে মূল বেতনকেই বুঝায়। কর্মী যদি তাকে প্রদত্ত বেতন অন্যায্য মনে করে তাহলে কাজে সে নিরুৎসাহ বোধ করে।

২. **মুনাফার অংশ (Profit Sharing)** ঃ সাধারণভাবে মুনাফা মালিকের প্রাপ্য। কর্মীদের যদি মুনাফার একটি অংশ দেয়া হয় তা হলে প্রতিষ্ঠানকে নিজের ভাবতে যেমনি তারা উৎসাহিত হয় তেমনিভাবে মুনাফা বৃদ্ধির জন্যও তারা সচেষ্ট থাকে।

৩. **উৎপাদন বোনাস (Productivity bonus)** ঃ এ পদ্ধতিতে আর্থিক প্ররোচক প্রদান কল্পে কোন নির্দিষ্ট কাজে কর্মচারীদের উৎপাদন মুল্যায়নের জন্য একটি আদর্শ হার বা মান সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আদর্শ পরিমাণের চেয়ে বেশি, প্রতি ইউনিট উৎপাদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে বোনাস দেয়া হয অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যত বেশি উৎপাদন করতে পারে, তাকে একটি নির্দিষ্ট হারে তত বেশি বোনাস দেয়া হয়। উৎপাদন বোনাস ব্যক্তি বা দলগতভাবে দেয়া যেতে পারে।

৪. **কার্য সম্পাদন বোনাস (Performance bonus)** ঃ এ পদ্ধতিতে কোন কর্মচারীকে শুধু উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়ার পরিবর্তে, তার সামগ্রিক কার্যসম্পাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়া হয়। কার্যসম্পাদন = কর্মদক্ষতা * প্রেষণা এ সূত্র থেকে দেখা যায় যে, কার্যসম্পাদনের উপর কর্মক্ষমতা ও প্রেষণার প্রভাব সংযোজনশীল নয় বরং গুননশীল। নিম্নে

চিত্রে প্রেষণার সাথে কার্যসম্পাদনের সম্পর্ক দেখানো হলো-

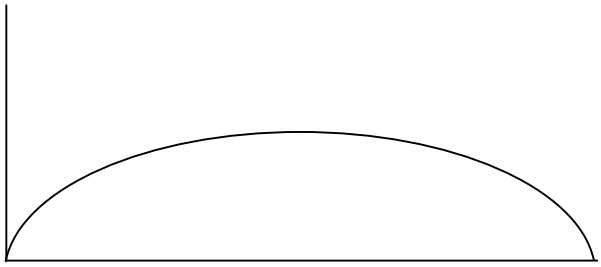

চিত্র ঃ প্রেষণার সাথে কার্যসম্পাদনের সম্পর্ক

প্রেষণার মাত্রা যখন মাঝামাঝি থাকে, তখন কার্য সম্পাদনের মাত্রা সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায়। প্রেষণার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্য সম্পাদন কম হয়। তাই আর্থিক প্রেষণা দেবার সময় বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন খাতে কর্মী সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রেষিত না হয় তবে যথাযথ কার্য সম্পাদন বোনাস প্রদান করা জরুরী।

৫. **পদোন্নতি (Promotion)** ঃ কর্মীদের প্রেষিত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পদোন্নতি। দক্ষ ও যোগ্য কর্মীদের পদোন্নতি দানের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়।

৬. **চিকিৎসা সুবিধা (Medicale facilities)** ঃ শ্রমিককর্মীদের সুচিকিৎসা প্রদান করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কর্মীদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করার জন্য বিনামূল্যে কর্মীদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে তারা কাজে উৎসাহ খুঁজে পায়। অবশ্য এক্ষেত্রে চিকিৎসা ভাতাও দেয়া যেতে পারে।

৭. **বাসস্থানের ব্যবস্থাকরণ (Accommodation facilities)** ঃ বাসস্থান সুবিধা মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এ সুবিধা প্রদান করেও কর্মীদের প্রণোদিত করা যায়। তবে বাসস্থানের পরিবর্তে কর্মীদের বাসস্থান ভাতাও দেয়া যেতে পারে।

৮. **পরিবহন সুবিধা (Transportation Facilities)** ঃ কর্মচারীদের যাতায়াত সমস্যা একটি বড় ধরনের সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য যদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে কর্মীরা কাজে উৎসাহিত হয়।

৯. **পুরস্কার (Rewards)** ঃ কর্মীদের যদি ভাল কাজের পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তাদের কাছ থেকে সৃষ্টিশীল কাজ আদায় করা সম্ভব। কেননা এতে তারা কাজের স্বীকৃতি পায়।

১০. **দলগত প্ররোচক পরিকল্পনা (Group incentive plan)** ঃ এ পদ্ধতিতে কোন কর্মদল (work group) এর সদস্যকে ব্যক্তিগত উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দিয়ে, তার দলের সামগ্রিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বোনাস দেয়া হয়। দলগত ভাবে উৎপাদন বোনাস প্রদান করার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, কোন কোন কর্মে ব্যক্তির উৎপাদনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা দূরূহ ব্যাপার।

১১. **প্রান্তিক সুবিধা (Fringe benefits)** ঃ আর্থিক প্ররোচক বলতে শুধু মজুরি বা বেতনকে বুঝায় না। চাকরিতে বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক সুবিধাও (যেমন, চিকিৎসা ভাতা, বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, চিত্তবিনোদন ভাতা, অবসর ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ডোর সুবিধা ইত্যাদি) আর্থিক প্ররোচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রান্তিক সুবিধাসমূহ প্ররোচক হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২. **অন্যান্য আর্থিক সুবিধা (Other financial facilities)**ঃ উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া প্রেষণাদানের আরও কয়েকটি উপাদান রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ইত্যাদি। বর্তমান বেতনের বিপরীতে কর্মীদেরকে ঋণ বা অগ্রিমও প্রদান করে হয়ে থাকে।

১৩. **রেশন সুবিধা (Ration facilities)**ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে কর্মীদেরকে বাঁচানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে কমমূল্যে দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। এতে কর্মীরা কাজে উদ্দীপ্ত হয়।

আর্থিক প্ররোচক প্রেষণা প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে তবে অর্ধস্তন কর্মীরা সাধারণতঃ এক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় প্রেষিত হয়। তবে সাথে সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।

খ. অনার্থিক প্রেষণা (Non-financial Motivation)

অর্থের বাইরে যে সকল উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় তাকে অনার্থিক প্রেষণা বলা হয়। শিল্পক্ষেত্রে কর্ম প্রেষণা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকম অনার্থিক প্ররোচক ব্যবহৃত হয়। যেমন, ভাল কার্য সম্পাদনের স্বীকৃতি ও পুরস্কার, ফলাফলের জ্ঞান, প্রতিযোগিতা, অভিন্ন লক্ষ্য, দায়িত্বে অংশীদারিত্ব, সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, কাজের নিরাপত্তা, কার্যাবলীতে স্বাধিকার, পদোন্নতির সুযোগ, সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক, প্রশিক্ষণের সুবিধা, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ, সরাসরি যোগাযোগ এবং সৃজনশীলতায় উৎসাহ দান। এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

১. **স্বীকৃতি ও পুরস্কার (Recognition and Reward) ঃ** ভাল কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ফলে আত্মতৃপ্তি অর্জিত হয়। স্বীকৃতি লাভ মানুষের কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি করে এবং তাকে ক্রমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একাগ্র ও উৎকর্সকৃত করে তোলে। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সাধারণতঃ স্বীকৃতি ও পুরস্কার এর মাধ্যমে বেশি মাত্রায় কার্য প্রেষিত হয়।

২. **ফলাফলের জ্ঞান (Feedback) ঃ** ফলাফলের জ্ঞান ব্যক্তিগত ও দলগত উভয় ধরনের কার্যসম্পাদনের জন্যই প্রেষণা বৃদ্ধি করে। কার্যের ফলাফলের জ্ঞান নিপুণভাবে কার্যসম্পাদনে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. **প্রতিযোগিতা (Competition) ঃ** মানুষের কর্ম প্রেষণা বৃদ্ধির আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক কর্ম পরিবেশ সৃস্টি করা। প্রতিযোগিতামূলক কার্য পরিবেশে ব্যক্তি কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

৪. **অভিন্ন লক্ষ্য (Common Goal) ঃ** প্রেষিত আচরণ সর্বদাই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে কার্য প্রেষণা সৃষ্টি করতে হলে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও কর্মচারীদের লক্ষ্য অভিন্ন হতে হবে। লক্ষ্য অভিন্ন হলে কর্মীরা কার্যে প্রেষিত হয়।

৫. **সিদ্ধান্ত অংশ গ্রহণ (Participation in Decision Making) ঃ** কোন নির্দিষ্ট কর্মের ব্যাপারে আগ্রহও প্রেষণা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, কর্মীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। সাধারণতঃ উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকরা এ সুযোগ পেলে বেশি মাত্রায় কার্যে প্রেষিত হয়।

৬. **চাকরির নিরাপত্তা (Job Security) ঃ** কর্মজীবনে অনিশ্চয়তা ও চাকুরিচ্যুতির ভয় থেকে প্রত্যেকেই নিরাপত্তা চায়। চাকুরী নিরাপত্তা না থাকলে কোন কর্মী কাজে মনোযোগ দিতে পারে না এবং কার্যে প্রেষিত হয় না। তবে নিম্নস্তরের কর্মীরা চাকুরী নিরাপত্তা বিষয়টি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

৭. **কর্মে স্বায়ত্তশাসন (Autonomy in Work) ঃ** সাধারণতঃ মানুষ কর্মক্ষেত্রে স্বাধিকার চায়। নিজস্ব কর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি অন্যের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান বৃদ্ধির ঘাটিয়ে কাজ করার স্বাধীনতা পেলে কর্মে তার উৎসাহ, উদ্দীপনা, দায়িত্ববোধ, সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।তবে উচ্চস্তরের কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কর্মচারীদের চেয়ে স্বায়ত্বশাসনকে কর্মসন্তুষ্টি ও প্রেষণার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করে।

৮. **পদোন্নতির সুযোগ (Opportunity for Promotion) ঃ** প্রত্যেক পেশাগত জীবনে পদোন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করে। নিম্নস্তরের কর্মীদের চেয়ে ব্যবস্থাপনা ও নির্বাহী কর্মকর্তারা পদমর্যাদার বেশি গুরুত্ব দেন। একটি গবেষণা হতে দেখা গেছে যে কর্মচারীরা পদোন্নতিকে কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে।

৯. **সহকর্মীদের সাথে ভাল সম্পর্ক (Good Relation with Co-workeny) ঃ** সহকর্মীদের সাথে ভাল সম্পর্ক ব্যক্তি ও দলের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে ও কর্মীর মনোবল ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে।

১০. **সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ (Adoption of Sound Management Priniciples) ঃ** কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মনোবল, কর্ম সন্তুষ্টি, ও প্রেষণা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ। এর মাধ্যমে কর্মীদেরকে কার্যে প্রেষিত করা যায়।

১১. প্রশিক্ষণের সুবিধা (Training Facilities) ঃ উত্তম প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুবিধা থাকলে কর্মীরা কার্যে প্রেষিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক ও নির্বাহীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মে অধিকতর দায়িত্ববান হয়।

১২. উন্মুক্ত যোগাযোগ (Open Communication) ঃ শ্রমিক ব্যবস্থাপকের মধ্যে মতামত বিনিময়ের কার্যকরী ব্যবস্থা থাকলে কর্মীদের মনোবল ও কর্মপ্রেষণা বৃদ্ধি পায়।

১৩. শিক্ষার সুযোগ (Education Facilities)ঃ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া হলে কর্মীরা উৎসাহিত হবে।

১৪. শ্রমিক-সংঘ করার সুযোগ দান (Granting Union Right)ঃ বর্তমানকালে শ্রমিকসংঘ করার অধিকার কর্মীদের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। কর্মীদেরকে শ্রমিকসংঘ গঠন করার সুযোগ দিয়ে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায়। এতে তারা অনুপ্রেষিত হয়।

১৫. সৃজনশীলতার উৎসাহ প্রদান (Encourgement of Creativity) ঃ মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হচ্ছে সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করা। কর্মে সৃজনশীলতার সুযোগ থাকলে কর্মীরা কর্মে প্রেষিত হয়। সাধারণতঃ উচ্চ স্তরে কর্মীরা এতে কার্যে প্রেষিত হয়।

আর্থিক ও অনার্থক উভয় ধরণের প্ররোচকই কর্মীর প্রেষণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে নিম্নস্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে আর্থিক প্ররোচক ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আবার ব্যবস্থাপক ও নির্বাহী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অনার্থিক প্ররোচক কর্যে প্রেষিত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, কর্মীদের প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে আর্থিক ও অনার্থিক উভয় উপাদানই সমান গুরুত্ব বহন করে। কেননা, অর্থ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হলেও উপরিউক্ত অনার্থিক উপাদানগুলোও মানব হৃদয়ে প্রশান্তি আনে, জীবনকে করে পরিতৃপ্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রেষণা চক্র , কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় বা কৌশল সম্পর্কে বোঝানোর জন্য একটি ধারণাচিত্র অংকন করুন।

সারসংক্ষেপঃ

মানুষ তার জীবনে কোন না কোন অভাব দ্বারা তাড়িত। মানুষের একটি চাহিদা পুরণ হলে অন্য একটি চাহিদা তার সামনে হাজির হয়। প্রেষণা চক্রের আকারে আবর্তিত হয়ে মানুষের এ সব নিত্য নতুন চাহিদা পূরণ করে থাকে। অর্থাৎ প্রেষণা একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের অভাববোধ থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্য দিয়ে। প্রেষণা একটিচক্রের ন্যায় আবর্তিত হয় বিধায় এটিকে প্রেষণা চক্র বলা হয়।বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে কর্মীদিগকে কাজে অনুপ্রাণিত করার প্রক্রিয়াকে আর্থিক প্রেষণা হিসাবে অভিহিত করা যায়।অর্থেও সাথেই ইহা সম্পৃক্ত। অর্থেও বাইওে যে সকল উদ্দীপক ব্যবহৃত হয় তাকে অনার্থিক প্রেষণা বলা হয়।শিল্পক্ষেত্রে কর্ম প্রেষণা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকম অনার্থিক প্ররোচক ব্যবহৃত হয়। যেমন, ভালকার্য সম্পাদনের স্বীকৃড়ু ও পুরস্কার, ফলাফলের জ্ঞান, প্রতিযোগিতা, অভিন্নলক্ষ্য, দায়িত্বে অংশীদারিত্ব, সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ, কাজেরনিরাপত্তা, কার্যাবলী তে স্বাধিকার, পদোন্নতির সুযোগ, সহকর্মীদেও সাথে সুসম্পর্ক, প্রশিক্ষণের সুবিধা, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা অনুসরণ, সরাসরি যোগাযোগ এবং সৃজনশীলতায় উৎসাহ দান।

পাঠ-৯.৩ প্রেষণার তত্ত্বসমূহ, বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি, প্রেষণার সীমাবদ্ধতা

Theories of Motivation, Ways or Methods of Motivating the Industiral Workers in Bangladesh, Limitations of Motivation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রেষণার তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রেষণার সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রেষণার তত্ত্বসমূহ

Theories of Motivation

প্রেষণা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক *F. W. Taylor* থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ কর্মীদের প্রেষণা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব প্রদান করেছেন। প্রেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষি ও গবেষক বিভিন্ন তত্ত্বের উন্নয়ন সাধন করেছেন। প্রেষণা সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি তত্ত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) মাজলো'র চাহিদা-সোপান তত্ত্ব

Maslow's Need Hierarchy Theory

আব্রাহাম মাজলো একজন মনোবিজ্ঞানী। তার প্রদত্ত প্রেষণার স্তরীভূত সোপান তত্ত্ব, প্রেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বে মানুষের প্রয়োজনকে পাঁচটি স্তরে বা পর্যায়ক্রমে ভাগ করা হয়েছে। তার মতে নিচের স্তরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পরই মানুষ পরবর্তী স্তরের প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে ধাপে ধাপে মানুষের প্রয়োজনবোধ সর্বোচ্চ স্তরে চলে যায়। মাজলো'র মতে, ব্যবস্থাপকদের কাজ হচ্ছে কোন্ কর্মী চাহিদার কোন্ স্তরে আছে তা নিরূপণ করার পর সে স্তরের চাহিদাগুলো মেটানোর চেষ্টা করা। এ চাহিদাগুলো নিম্নরূপ রেখা চিত্রের সাহায্যে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হলো ঃ

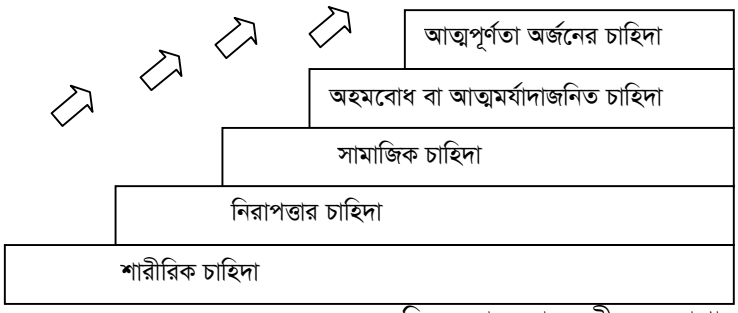

চিত্র ঃ মাজলোর স্তরীভূত সোপান তত্ত্ব

চিত্রে প্রদত্ত মাজলোর প্রেষণার স্তরীভূত সোপান তত্ত্বের প্রতিটি স্তরের আলোচনা করা হলো ঃ

(১) দৈহিক প্রয়োজন (Physiological Need): বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যা কিছু দরকার তাই হলো দৈহিক প্রয়োজন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, আলো, বাতাস ইত্যাদি সবকিছুই দৈহিক প্রয়োজনের আওতায় পরে। এগুলো ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। কাজেই এগুলো সবার আগে পূরণ করা প্রয়োজন। সংগঠনের কর্মীরা তাই সবার আগে বেতন ভাতার মাধ্যমে খাবার, কাপড় ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা চায়। এই ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষ সব কিছুই করতে রাজী থাকে।

(২) নিরাপত্তার প্রয়োজন (Security Need): দৈহিক প্রয়োজন যখন মোটামুটিভাবে মিটে যায়, তখন মানুষ নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভব করে। নিরাপত্তা দু'রকমের হতে পারে একটি হলো দৈহিক নিরাপত্তা আর অন্যটি হলো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। মানুষ যেমন জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সাধারণত নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, তেমনি রুটি-রুজির নিরাপত্তা খোঁজে। কাজেই চাকুরীর স্থায়ীকরণ, ভবিষ্যৎ সঞ্চয় করা ইত্যাদি নিরাপত্তাজনিত অভাববোধ, বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের নিশ্চয়তার ভাবনা থেকেই মানুষের নিরাপত্তাজনিত প্রয়োজন অনুভূত হয়।

(৩) সামাজিক প্রয়োজন (Social Need) : মানুষ যখন কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তায় তুষ্ট হয় তখনই সে বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর প্রশংসা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেতে আগ্রহী হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরাও যখন প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধাসহ স্থায়ী চাকুরিতে বহাল হয় তখনই তারা সামাজিক প্রয়োজন অনুভব করে এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়।

(৪) আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন (Esteem Need) : অন্যান্য প্রয়োজন মিটানোর পর মানুষ আত্মতৃপ্তির উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আত্মতৃপ্তিতেই অনেকে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে ইহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ আত্মতৃপ্তির জন্যই কর্মীদের বড় চাকুরী, গাড়ী, বাড়ী ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। নিচের তিনটি ধাপ পুরণ হলে বা প্রয়োজন মিটে গেলেই মানুষের কাছে আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়।

(৫) পূর্ণতার প্রয়োজন (Self-actualization Need) : আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন মোটামুটিভাবে মিটে গেলে মানুষ পূর্ণতার প্রয়োজন অনুভব করে। মাজলোর মতে এটি প্রয়োজনের সবচাইতে উপরের স্তর। এটা হলো মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা। মানুষ যে কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেন, যখন যে কাজটি সবচাইতে ভালভাবে করার চেষ্টা চালায়, তখন তার পূর্ণতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

(খ) হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
(Herzberg's Two Factor Theory)

সংগঠনের পটভূমিতে পরিচালিত গবেষণায় হার্জবার্গ ও তার সহযোগীরা প্রেষণার ক্ষেত্রে দুই ধরনের উপাদানের ভূমিকা লক্ষ্য করেন। এ দু'টি হলো মোটিভেটর (Motivator) ও হাইজিন (Hygiene)। গবেষণায় তারা লক্ষ্য করেন যে, কর্মীদের কাজের সন্তুষ্টি মূলত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত চলকগুলোর উপর নির্ভর করে এবং কর্মে অসুন্তষ্টি কাজের বাইরের চলক বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রথম দলের চলকগুলোকে মোটিভেটর এবং দ্বিতীয় দলের চলকগুলোকে তারা হাইজিন উৎপাদক বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মোটিভেটর বা সন্তুষ্টি উৎপাদক কাজের আভ্যন্তরিণ উপাদান। আর হাইজিন বা অসন্তুষ্টি উৎপাদক মূলতঃ কাজের বাহ্যিক বা পরিবেশগত উপাদান। নিচে এই দুই ধরনের চলকের কয়েকটি উৎপাদক তুলে ধরা হলো ঃ

মোটিভেটর বা সন্তুষ্টি উৎপাদক	হাইজীন বা অসন্তুষ্টি উৎপাদক
কাজের স্বীকৃতি	সংগঠনের নীতি ও রীতি
পদোন্নতি	বেতন ও ভাতা
দায়িত্ব	পারস্পরিক সম্পর্ক
কীর্তি	কাজের নিরাপত্তা
কাজটি নিজেই	কাজের পরিবেশ

যে সমস্ত চলক না হলে কাজে সন্তুষ্টি আসে না সেগুলোকে মোটিভেটর উৎপাদক বলে। আর যে সমস্ত চলকের অভাবে

কাজে অসন্তুষ্টি আসে তাকে হাইজীন উৎপাদক বলে। কর্মীদের কাজে সন্তুষ্টি আনতে হলে সন্তুষ্টির উৎপাদকগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

(গ) ভিক্টর এইচ ভ্রুমের প্রত্যাশা তত্ত্ব
(Victor H. Vroom's Expectancy Theory)

প্রেষণার ক্ষেত্রে প্রত্যাশা তত্ত্বের মূল কথা হলো, মানুষ যখন মনে করে তার কাজের মাধ্যমে কোন ফলাফল অর্জন করা সম্ভব- তখনই কাজটি করার প্রেষণা অনুভব করে। প্রত্যাশার মাধ্যমে প্রেষণা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভ্রুম, মানুষের পছন্দ ও বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তার মতে ব্যক্তির প্রেষণার শক্তি নির্ভর করে তার সামগ্রিক পছন্দ এবং প্রত্যাশার গুণিতক সম্পর্কের উপর। অর্থাৎ-

Force = Valence □ Expectancy
(প্রেষণার শক্তি = সামগ্রিক পছন্দ * প্রত্যাশা)

এখানে ভ্যালেন্স হলো ফলাফলের প্রতি ব্যক্তির তুলনামূলক সামগ্রিক পছন্দ এবং প্রত্যাশা হলো সেই ফলাফলটি তার প্রেষণার মাধ্যমে ঘটবার সম্ভাবনা। কাজেই কোন কাজের ফলাফল ঘটবার প্রত্যাশা যদি না থাকে তাহলে তার প্রতি ব্যক্তির কোন প্রেষণা থাকবে না। আবার ফলাফলটি যদি তার পছন্দনীয় না হয় তাহলেও ব্যক্তি সে কাজটি করার প্রেষণা অনুভব করবে না।

(ঘ) ম্যাকলেল্যান্ড এর কীর্তিমূলক প্রেষণা তত্ত্ব
(Mecllеland's Theory of Achievement Motivation)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডেভিড ম্যাকনিন্যাণ্ড ও তাঁর সহযোগি এ্যাটকিনসন (Atkison) এর তত্ত্বের জনক। মানুষ কাজ করে কৃতিত্ব অর্জন করতে চায়। গবেষকগণ মনে করেন, "কাজের মাধ্যমে কৃতিত্বার্জন করাই উদ্যোক্তাদের উচ্চমাত্রায় প্রেষণা। এটি মানুষকে উচ্চ মাত্রায় কার্য সম্পাদনে উৎসাহিত করে।"

ম্যাকলেল্যান্ড তিন ধরনের মুল প্রয়োজন চিহ্নিত করেছেন, যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো-

- সংলগ্নতার প্রয়োজন
- ক্ষমতার প্রয়োজন
- স্বীকৃতির প্রয়োজন।

গবেষণার মাধ্যমে ম্যাকলেল্যাণ্ড দেখেছেন যে, যে সব ব্যক্তির মধ্যে সংলগ্নতার প্রয়োজন বেশী তারা সহকর্মীদের সমর্থন ও ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বেশী কামনা করে। ব্যক্তি হিসেবে তারা সবার সাথে সখ্যতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকে। যাদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োজন বেশী তারা নেতা হতে চায়, সিদ্ধান্ত নিতে চায় এবং ক্ষমতাও প্রভাব বিস্তারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

যারা কীর্তির প্রয়োজন বেশী মাত্রায় অনুভব করে, তাদের মধ্যে সফল হবার প্রবল ইচ্ছা এবং ব্যর্থ হবার প্রবল অনিচ্ছা দেখা দেয়। তারা দুঃসাহসিক কাজ করতে পছন্দ করে। অবশ্য তারা অতিমাত্রায় ঝুঁকি নেয় না। যে কাজের ফলাফল তাদের উপর নির্ভরশীল সেসব কাজে তারা বেশী আগ্রহী হয়। অর্থাৎ কখনও তারা ভাগ্যের উপর ভরসা করে না।

বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি

Ways or Methods of Motivating Industiral Workers in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দ্রুত এর অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে এটি একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। আমাদের দেশে প্রচুর কল-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেকটাই অনুপস্থিত। এদেশের শ্রমিকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চত করা দুসাধ্য হয়ে পড়ে। সে কারণে অন্যান্য অনার্থিক পদ্ধতি এখানে খুব সামান্যই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যা হোক, বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হল ঃ

আর্থিক প্রেষণা পদ্ধতি (Financial Methods of Motivation)

১. **পারিশ্রমিক (Remuneration) ঃ** বাংলাদেশের শ্রমিককর্মীদের প্রেষণাদানের প্রদানতম উপায় হচ্ছে পারিশ্রমিক বা মজুরি প্রদান। শ্রমিকরা মজুরির প্রত্যাশায় তাদের সকল শক্তি প্রতিষ্ঠানের কাজে বিনিয়োজিত করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিককর্মীদের যে পরিমাণ আর্থিক মজুরি প্রদান করা হয় তা মোটেও পর্যাপ্ত নয়।

২. **বোনাস (Bonus) ঃ** বাংলাদেশের শ্রমিক-কর্মীদের বিভিন্ন উৎসব যেমন- ঈদ, পূজা-পার্বন ইত্যাদি উপলক্ষে বোনাস প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত বোনাসের অর্থের পরিমাণ হয় একমাসের মূল বেতনের সমান। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাধারণত বার্ষিক দুটি বোনাস দেয়া হয়ে থাকে। তবে কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একেবারেই বোনাস প্রদান করে না, আবার কিছু কিছু লাভজনক প্রতিষ্ঠান দুটির অধিক বোনাসও দেয়। এছাড়া বর্তমান সরকার ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি নববর্ষ উদযাপনের জন্য মূল বেতনের অর্ধেক পরিমাণ বোনাস প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

৩. **চিকিৎসা সুবিধা (Medical facilities) ঃ** আমাদের দেশের বৃহৎ সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকে। তবে সেখানে সেবার মান অপ্রতুল। অবশ্য বাংলাদেশে সকল সরকারি কর্মচারীকেই চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই শুধু চিকিৎসা সুবিধা থাকে।

৪. **বাসস্থান সুবিধা (Housing facilities) ঃ** বাংলাদেশে মহানগরী কিংবা বড় বড় শহরকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য সীমিত ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বাসস্থান না থাকলেও বাড়িভাড়া ভাতা হিসেবে মূল বেতনের শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগ আর্থিক সুবিধা তারা পেয়ে থাকে।

৫. **পরিবহন সুবিধা (Transportation facilities) ঃ** বাংলাদেশে সীমিত সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিবহন সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ কারণে এদেশে অধিকাংশ কর্মীকে এমনকি কর্তা ব্যক্তিদেরকেও সাধারণ বাসে কর্মস্থলে যেতে দেখা যায়। বেসরকারি সংগঠনসমূহে উর্ধতন কর্মকর্তা পর্যায়ে এ সুবিধা কিছুটা বিদ্যমান থাকলেও শ্রমিক-কর্মীদের বেলায় এটি একেবারেই অনুপস্থিত। এছাড়া মহানগরীসমূহের বাইরে পরিবহন সুবিধা নেই বললেই চলে।

৬. **অন্যান্য সুবিধা (Other allowances) ঃ** বাংলাদেশের শ্রমিক-কর্মীদের আরও কিছু আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমাদের শিল্প সংগঠনে পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ভবিষ্যত তহবিল গ্রুপ বীমা, বিভিন্ন প্রকারের অগ্রিম সুবিধা ইত্যাদি।

৭. **অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা (Financial benifits at retirement period) ঃ** এ দেশে শিল্প সংগঠন ও অন্যান্য কর্মীদের প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে আর একটি উপায় হচ্ছে অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি অনুদানে পরিচালিত প্রায় সকল সংগঠনে অবসরকালে পেনসন, গ্র্যাচুইটি, অবসর প্রস্তুতি, ছুটিকালীন বেতন, মাতৃত্ব ছুটি ইত্যাদি সুবিধাদি দেওয়া হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এগুলো দেখা যায় না বললেই চলে।

অনার্থিক প্রেষণা পদ্ধতি (Non-Financial Methods of Motivation)

১. **চাকুরির নিরাপত্তা (Job security) ঃ** বাংলাদেশে সরকারি সংগঠনসমূহের শিল্প শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু অনেক বেসরকারি সংগঠনে চাকুরির নিরাপত্তা একেবারেই নেই। মালিকের খেয়াল খুশির উপরই শ্রমিকের চাকুরি পুরোপুরি নির্ভর করে।

২. **পদোন্নতি (Promotion) ঃ** এদেশে বেসরকারি কিছু সংগঠন রয়েছে যেমন পোশাক শিল্প, সেখানে শ্রমিকদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে দ্রুতগতিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। সরকারি সংগঠনে পদোন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে কিন্তু এ পদোন্নতির গতি নিতান্তই ধীর। অনেক ছোটখাটো বেসরকারি সংগঠনে কোন পদোন্নতি দেওয়া হয় না।

৩. **শ্রমিক সংঘ করার সুযোগ (Trade union facilities) ঃ** বাংলাদেশে সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-কর্মীদের সংঘ/সমিতি করার সুযোগ রয়েছে। ফলে শ্রমিক-কর্মী তাদের চাহিদা এবং সুযোগ সুবিধার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ দাবি তোলার সুযোগ পাচ্ছে। তবে বেসরকারি সংগঠনে এ সুযোগ একেবারেই কম।

৪. **প্রশিক্ষণ সুবিধা (Training facilities) ঃ** বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রেষণাদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ খুবই কম। কিছু কিছু সংগঠন শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৫. **অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (Other facilities) ঃ** বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প-শ্রমিকদের প্রেষণাদানের লক্ষ্যে আরও কিছু ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কর্মীদের সন্তানাদির লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা, কর্মী ও তাদের সন্তানদের জন্য বিভিন্ন রকম চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

শিল্প-শ্রমিকদের প্রেষণাদানের জন্য বহুবিধ উপায় বা পদ্ধতি উপস্থিত থাকলেও বাংলাদেশে উপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলোই প্রধানত অনুসৃত হয়ে থাকে। ফলে বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রেষণা মান খুব একটা উঁচু নয়। প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রেষণার পাশাপাশি অনার্থিক দিকটি বিবেচনা করলে এর মান বাড়ানো সম্ভব হবে।

প্রেষণার সীমাবদ্ধতা

Limitations of Motivation

প্রেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রতি কর্মীদের উৎসাহিত করার একটি প্রক্রিয়া। এটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু প্রেষণাদানের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও দুরুহ কাজ। প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান বা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১. **চাহিদার ভিন্নতা (Variation in needs) ঃ** একটি প্রতিষ্ঠানে বিচিত্র ধরনের কর্মী থাকে। তাদের প্রয়োজনেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একজন হয়ত অর্থ পেলে সন্তুষ্ট থাকে, ঠিক অন্যজন স্বাধীনতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। চাহিদার এরূপ বিভিন্নতার কারণে কর্মীদের প্রেষণাদান কঠিন হয়ে পড়ে।

২. **মানসিকতার পার্থক্য (Differences in mentality) ঃ** প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর মনমানসিকতা একরূপ থাকে না। শিক্ষা, রুচি, ধর্মীয় ও রাজনেতিক বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে তাদের মানসিকতায় পার্থক্য দেখা যায়। এসব ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে তাদেরকে প্রেষণাদান একটি কঠিন ব্যাপার।

৩. **ব্যবস্থাপনার পক্ষপাতিত্ব (Partiality of management) ঃ** প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যদি কর্মীদের প্রতি সমতাভিত্তিক আচরণ কিংবা সুবিচার না করেন, তবে কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের প্রেষণা পাবার ক্ষেত্রে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

৪. **মর্যাদাগত পার্থক্য (Differences in status) ঃ** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মানবিক উপাদানে স্তরগত পার্থক্য থাকে। এতে তাদের মর্যাদাগত ভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। ফলে সকল শ্রেণীকে একই পদ্ধতি ব্যবহার করে অনুপ্রেষিত করা যায় না।

৫. **কাজের ধরন (Nature of Job) ঃ** সকল কর্মী একই কাজে সমান তৃপ্তিবোধ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, সব ধরনের কাজে সবাই সমান আনন্দ পায় না। কারো হয়ত চবি আঁকার কাজ অধিক পছন্দনীয়, আবার কেউ হয়তো হিসাবরক্ষণের কাজে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ কারণে একই ধরনের প্রেষণা পদ্ধতি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এটি প্রেষণা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

৬. **কর্মীদের ক্ষমতা ও দক্ষতার ভিন্নতা (Differences in ability and efficiency of employees) ঃ** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের সকলের কাজের ক্ষমতা ও দক্ষতা সমান থাকে না। ফলে একই পদ্ধতিতে সকল কর্মীকে প্রেষণা প্রদান করা হলে তা অনেক ক্ষেত্রেই সকফলতা আনতে পারে না।

৭. **শ্রমিক সংঘের অসহযোগিতা (Non-cooperation of trade union) ঃ** প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন অনেক সময়ই ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করে না। ফলে কর্মী প্রেষণার জন্য গৃহীত কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়ে যায়। বাংলাদেশের সরকারি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা।

৮. **পরিবর্তনে বাধা (Hindrances in flexibility) ঃ** প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা কখনো কখনো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কর্মীদের একবার কোন সুবিধা প্রদানের পর সেক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন আনলে কর্মীরা তা সহজে মেনে নিতে চায় না। এ কারণে ব্যবস্থাপকগণ অনেক সময়ই কর্মীদের প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনে বাধ্য হন।

৯. **ব্যবস্থাপকদের সীমাবদ্ধতা (Limitations of managers) ঃ** ব্যবস্থাপকগণ অনেক সময়ই কর্মীদের চাওয়া-পাওয়া, তাদের সুযোগ-সুবিধা এবং মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে পারেন না। আবার পারলেও কখনো কখনো এর বাস্তবায়নে আন্তরিক হন না। তাদের এরূপ অনাগ্রহ কর্মীদের প্রেষণা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

১০. **আর্থিক সীমাবদ্ধতা (Financial limitations) ঃ** প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে 'অর্থ' সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ব্যবস্থাপকদের আন্তরিকতা থাকলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানই কর্মীদের ন্যায্য বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি দিতে পারে না। ফলে প্রেষণা কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

প্রেষণাদানে উপরের আলোচিত প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও উৎপাদনের উপকরণের সীমাবদ্ধতা, ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব, কর্মীদের যথোপযুক্ত কাজে নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি কতিপয় কারণ প্রেষণাদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব বিবেচনায় রেখে প্রেষণা প্রদান করা হলে তা কিছুটা সুফল বয়ে আনতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রেষণার তত্ত্বসমূহ,বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি, প্রেষণার সীমাবদ্ধতার একটি চিত্র অংকন করুন ও তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ:

প্রেষণা সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক *F. W. Taylor* থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ কর্মীদের প্রেষণা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব প্রদান করেছেন। প্রেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষি ও গবেষক বিভিন্ন তত্ত্বের উন্নয়ন সাধন করেছেন। আব্রাহাম মাজলো একজন মনোবিজ্ঞানী। তার প্রদত্ত প্রেষণার স্তরীভূত সোপান তত্ত্ব, প্রেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বে মানুষের প্রয়োজনকে পাঁচটি স্তরে বা পর্যায়ক্রমে ভাগ করা হয়েছে। তার মতে নিচের স্তরের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পরই মানুষ পরবর্তী স্তরের প্রয়োজন অনুভব করে। এভাবে ধাপে ধাপে মানুষের প্রয়োজনবোধ সর্বোচ্চ স্তরে চলে যায়। মাজলো'র মতে, ব্যবস্থাপকদের কাজ হচ্ছে কোন্ কর্মী চাহিদার কোন্ স্তরে আছে তা নিরূপণ করার পর সে স্তরের চাহিদাগুলো মেটানোর চেষ্টা করা। সংগঠনের পটভূমিতে পরিচালিত গবেষণায় হার্জবার্গ ও তার সহযোগীরা প্রেষণার ক্ষেত্রে দুই ধরনের উৎপাদাকের ভূমিকা লক্ষ্য করেন। এ দু'টি হলো মোটিভেটর (Motivator) ও হাইজিন (Hygiene)। গবেষণায় তারা লক্ষ্য করেন যে, কর্মীদের কাজের সন্তুষ্টি মূলত কাজের সাথে সরাসরি জড়িত চলকগুলোর উপর নির্ভর করে এবং কর্মে অসুন্তষ্টি কাজের বাইরের চলক বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রথম দলের চলকগুলোকে মোটিভেটর এবং দ্বিতীয় দলের চলকগুলোকে তারা হাইজিন উৎপাদক বলে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মোটিভেটর বা সন্তুষ্টি উৎপাদক কাজের আভ্যন্তরিণ উপাদান। আর হাইজিন বা অসন্তুষ্টি উৎপাদক মূলতঃ কাজের বাহ্যিক বা পরিবেশগত উপাদান।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. প্রেষণার সংজ্ঞা দিন।
২. প্রেষণার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৩. প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. প্রেষণা বলতে কি বুঝেন? ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৫. কর্মীদের প্রেষণাদানের উপায় সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৬. অনার্থিক প্রেষণাদানের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
৭. কর্মীদের প্রেষণাদানের কৌশল আলোচনা করুন।
৮. প্রেষণা চক্র সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৯. প্রেষণার ক্ষেত্রে মাজলোর স্তরীভূত সোপান তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
১০. হার্জবার্গের দ্বি উপাদান তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
১১. ভিক্টর এইচ ভ্রুমের প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্বটি আলোচনা করুন।
১২. নেতৃত্বের লক্ষ্যপথ তত্বটি আলোচনা করুন।
১৩. প্রেষণার সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করুন।
১৪. বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকদের প্রেষণাদানের বিভিন্ন উপায় বা পদ্ধতি আলোচনা করুন।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Ricky W. Griffin, Management,12th Edition, AITBS Publication, New Delhi.
- Introduction to Management, Dr.M A Mannan & Dr. Md. Ataur Rahman
- Fundamental of Management (10th Edition), Stephen P Robbins, Mary Coulter, David A DeCenzo, Harlow Publisher, England Pearson (2017).